ঐতিহ্য আত্মোন্নয়ন গ্রন্থমালা

মহৎ জীবন

ডা. মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহমান

ঐতিহ্য

সূচি

মহৎ জীবন ৭

কাজ ৩১

ভদ্রতা ৫৭

মহৎ জীবন

সমুদ্রগর্ভে মোলোকাই দ্বীপে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নরনারীকে নির্বাসন দেওয়া হতো। কেউ তাদের দেখবার ছিল না, ব্যাধি-যন্ত্রণায়, দুঃখে তাদের জীবন শেষ হতো। চারদিকে সমুদ্র, তার মাঝে আর্ত নরনারী, বালক-বালিকা নিজেদের দুর্ভাগ্য ও আশাহীন, সান্ত্বনাহীন জীবন নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় কাল কাটাত। তারা আল্লাহকে ডাকত না, তাদের কোনো ধর্মজীবন ছিল না। তারা নিরন্তর ব্যাধি-যন্ত্রণায় হাহুতাশ করত, আর অদৃষ্টকে অভিশাপ দিত। যাদের জীবনে কোনো আশা নাই, যারা আত্মীয়পরিজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যাদের কোনো সমাজ নাই, যাদের কেউ শ্রদ্ধা করবার নাই, যাদের দুঃখ-ব্যথার কথা কেউ চিন্তা করে না—তাদের জীবন কত ভয়ানক, কত দুঃখময়, কত শোচনীয়!

এই অভিশপ্ত ও নির্বাসিত নরনারীর জন্য কার প্রাণ অস্থির হয়েছিল? — তাদের দুঃখের জীবন কার প্রাণে চিন্তা সৃষ্টি করেছিল? কে এই নির্বাসিতদের মাঝে যেয়ে তাদের সেবা করবে? তাদেরকে সান্ত্বনা দেবে? তাদেরকে আল্লাহ ও মহৎ জীবনের কথা শোনাবে? তারা যে অভিশপ্ত। কে যাবে সেই দুঃসহ ব্যাধির সংস্পর্শে? তাদের কাছে যাওয়ার অর্থ—নিজের জীবনের সকল আশাভরসা জলাঞ্জলি দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে কুষ্ঠব্যাধিকে বরণ করে নেওয়া।

দামিয়ান নামক এক যুবক বহুদিন হতে এই নির্বাসিতদের কথা চিন্তা করছিলেন। এই সুন্দর আকাশ, এই ভালো-গন্ধভরা মানবসমাজ, জীবনের সহস্র ভোগ-আকর্ষণ একদিকে, অন্যদিকে রোগ-পীড়িত নরনারীর করুণ মুখ,—আতুরের গগনবিদারী চিৎকার, —আর সীমাহীন আঁধার। ব্যথিতের করুণ মুখেরই জয় হলো। জীবনের সকল আশা-কামনাকে বিসর্জন দিয়ে

যুবক দামিয়ান নির্বাসিত কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের সেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বন্ধু প্রতিবাসীদের সমালোচনা, আত্মীয়স্বজনের মিনতি তাঁর সংকল্পকে দমাতে পারল না। দামিয়ান একদিন ফরাসি দেশের উপকূলকে শেষ নমস্কার করে একখানি বাইবেল আর একটা সাগরের মতো বিরাট আত্মা নিয়ে আর্তের সেবায় সমুদ্রপথে যাত্রা করলেন। অহো! বিরাট মনুষ্যত্ব! যে জীবন সহস্র ভোগের শিখা দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলা যেত,—সীমাহীন সুখ দিয়ে যাকে ভরে দেওয়া যেত, তা এখন দুঃস্থ নরনারীর চিৎকার-ক্রন্দনের মাঝে ব্যয়িত হতে লাগল। দামিয়ান পিতার মতো, মায়ের মতো, বন্ধুর মতো ব্যাধিগ্রস্ত মানুষগুলোকে সেবা করতে লাগলেন। তিনি যখন তাদেরকে নিয়ে সাগর-কূলে বসে আল্লাহর স্নেহের কথা বর্ণনা করতেন,—যখন তিনি বলতেন,—মানুষের জন্য এক অফুরন্ত আনন্দের রাজ্য আছে, আমরা সেই দিকে যাচ্ছি,— ব্যাধি-পীড়া দিয়ে খোদা আমাদেরকে তাঁর অসীম স্নেহের পরিচর দিচ্ছেন, তখন সবাই কাঁদত, আকাশ থেকে ফেরেশতারা আশীর্বাদের অশ্রু দিয়ে তাদের সংবর্ধনা করত, স্তব্ধ সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে বাতাস তাদের শোক- গৌরব গেয়ে ফিরত।

কী মহৎ এই মহাপুরুষের জীবন,—কত বড় তিনি ছিলেন!

উনিশ বৎসরের সেবার পর দামিয়ান একদিন বুঝতে পারলেন—কালব্যাধি তাঁকেও ধরেছে। তিনি সেদিন সকলকে এক জায়গায় করে বললেন, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। আজ তোমাদেরই মতো আমি একজন হয়েছি। এতদিন তোমাদের সঙ্গে আমার ভালো করে আত্মীয়তা হয় নাই,—একটু বিভেদ ছিল,— আজ খোদা সে বিভেদটুকু তুলে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমায় এক করে দিয়েছেন। আজ তাঁর স্নেহের কথা স্মরণ করে আমার চোখে জল আসছে! আজ আমাদের উপাসনা বড় মধুর, বড় সুন্দর হবে।

ক্রমে দামিয়ানের সোনার শরীর ভেঙে এল। অবশেষে এই মহাপুরুষ মানবসমাজে তাঁর মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে একদিন প্রাণত্যাগ করলেন। দামিয়ান মরেননি, —মানুষ চিরকাল তাঁর স্মৃতির সম্মান করবে।

এ জগতে মানুষ নিজের সুখের জন্য কত লালায়িত, মানুষের জন্য মানুষের সহানুভূতি ও বেদনাবোধ কত সুন্দর, কত মহৎ, —মানুষ তা কবে বুঝবে? প্রকৃত সুখ কোথায়? পরকে ফাঁকি দিয়ে নিজের সুখটুকু ভাগ করে দেওয়াতে কি সত্যিকারের সুখ আছে? আত্মার সাত্ত্বিক তৃপ্তির কাছে

জড়দেহের ভোগসুখের মূল্য কিছুই না। যতদিন না মানুষ পরকে সুখ দিতে আনন্দ বোধ করবে, ততদিন তার যথার্থ কল্যাণ নাই। আর্ত ক্ষুধিত আমার সামনে আঁখিজলে ভেসে বেড়াচ্ছে আমি কোন প্রাণে আনন্দ-উৎসবে যোগ দেব? আর্তের দুঃখের মীমাংসা চাই, ক্ষুধিতের ক্ষুধার শান্তি চাই।

মানুষের জড়দেহের ব্যথার জন্য যে বেদনাবোধ, এছাড়া আর এক প্রকার বেদনা-বোধ আছে। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে মানুষের আত্মার যে অবনতি ঘটে, তা দেখে মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা যে বেদনাবোধ করেন, তাও সমান মহত্ত্বের পরিচায়ক। আত্মার দারিদ্র্যও মানুষের শরীর ও মন উভয়কেই ধ্বংস করে।

মানুষের পাপ মানবসমাজকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যায়। তাঁর জন্য অসীম দুঃখ সৃষ্টি করে। পাপী শুধু নিজে পাপ করে না, তার অত্যাচারের আঘাত সহ্য করতে যেয়ে মানবসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। সে মানুষের চোখ থেকে রক্ত টেনে বের করে, সে মানব-হৃদয়ে চিতার আগুন জ্বেলে দেয়— সে জীবন্ত অভিশাপ হয়ে এ জগতে বাস করে। সে নিজের বুকে ছুরির আঘাত করে অথচ সে বুঝতে পারে না, সে কী করছে।

মানবসমাজকে বাঁচাবার জন্য অসীম প্রেমে, অনন্ত ব্যথা অনুভূতিতে মহাপুরুষেরা পাগল হয়ে যান। তাদের বিরাট স্নেহের কল্যাণ আহ্বানে যারা সাড়া দেয়, তারা সৌভাগ্য লাভ করে।

আরব সমাজের পাপ—আর ব্যথিতের মর্মপীড়া মহাপুরুষ মুহাম্মদকে (সা.) কাঁদিয়েছিল—তিনি মানুষ মানুষ বলে পথে বের হয়েছিলেন।

যুবক বুদ্ধের প্রাণে মানুষের দুঃখ ও ব্যথা কী অসীম বেদনা সৃষ্টি করেছিল— কত সুখ, কত বিলাস ত্যাগ করে ঘর ছেড়ে মানুষের দুঃখ-ব্যথার মীমাংসার জন্য তিনি বনে বনে ছয় বৎসর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে গাছ হয়ে গিয়েছিল। কী বিরাট মনুষ্যত্বের গৌরব দিয়ে খোদা তাঁকে এ জগতে পাঠিয়েছিলেন।

মানুষ যখন মহামানবতার পরিচয় দেন, তখন কেউ কেউ তাঁকে খোদার আসন দিয়ে থাকে। এতে মহামানুষদেরকে অপমান করা হয়। নারায়ণ হয়ে মহাপুরুষদের মোটেই তৃপ্তি হয় না, —তাঁরা চান—মানব-দুঃখের অবসান, অসত্য ও মিথ্যার বিরুদ্ধে মানবসমাজের বিদ্রোহ। মহামানুষেরা যদি মানব সাধারণের কাছ থেকে নারায়ণ উপাধি পান, তাতে তাঁদের জীবনের বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

জীবনে মহৎ হয়ে লাভ কী? —কেননা আমরা মানুষ। রাজা হবার দাবি একমাত্র মানুষেরই আছে। দুঃখ, পাপ ও অজ্ঞানের আঁধারকে দুই হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে আমাদেরকে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধে উঠতে হবে। কী বিরাট আলোক, কী অফুরন্ত আনন্দের রাজ্য মানুষের সামনে, মানুষ তার গৌরব ভুলে কী করে আঁধার ও মৃত্যুর পথে হাঁটবে? মানুষকে মহৎ হতে হবে, কারণ মহৎ হবার জন্যই সে এ জগতে এসেছিল। দুঃখ, ব্যথা, মায়া, প্রলোভনের ভিতর দিয়ে, সে যে কত বড়, তাই সে প্রমাণ করবে। মানুষ কত বড়, সে কী বিরাট, তার পক্ষে দুর্বলতার পরিচয় দেওয়া কত বড় বোকামি, এতে তার কতখানি অপমান হয়। সারা প্রকৃতি মানুষকে বড় হবার জন্য ডাকছে;—উদার আকাশ, উষার আলো, বাঁশরির রাগিণী মানব-কণ্ঠের সংগীতধ্বনি, আর্তের অশ্রু মানুষকে কেবলই মহত্ত্বের পথে ডাকছে। মিথ্যা এ জীবন, এ সুখ, এ বিষয়-বৈভব। জীবনে যে সৎকার্য করা যায়, তাই মানুষকে তৃপ্তি দিতে সক্ষম দালান-কোঠা-হাতি-ঘোড়া শতশত বিলাস-উপচার—কিছুরই মাঝে মানুষের তৃপ্তি নাই।

রানি ভিক্টোরিয়া একবার একখান মৃত্যুদণ্ডের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করতে যেয়ে সজল নয়নে ডিউক অব ওয়েলিংটনকে জিজ্ঞাসা করলেন—ডিউক, সত্যই কি এই ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হবে? একে কি কিছুতেই রক্ষা করা যায় না?

ডিউক অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—না মহারানি, এই ব্যক্তি তিনবার আইন অমান্য করেছে।

যার মৃত্যুর আদেশ দিতে হবে, সে ছিল একজন সৈনিক। সে তিনবার যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছিল। সৈনিকের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে যাওয়া গুরুতর অপরাধ, এতে তার প্রাণদণ্ড হয়।

মহারানি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে এই ব্যক্তির স্বপক্ষে কিছুই আপনার বলবার নাই? ডিউক বললেন—লোকটি সামরিক আইন অমান্য করলেও এর স্বভাব বড় ভালো।

দয়াবতী রানি তখনই কাগজের ওপর লিখলেন—এর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করা গেল।

হজরত আলীর সঙ্গে এক ব্যক্তির লড়াই হয়েছিল। লোকটির গায়ে অসীম শক্তি ছিল, মুসলমান সাম্রাজ্যের খলিফাও কম শক্তিশালী ছিলেন না। হজরত আলী তাকে যখন মাটির ওপর ফেলে হত্যা করবেন, তখন সে

হঠাৎ খলিফার মুখে থুতু ফেলে দিল। খলিফা তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—এখন যেতে পার, তোমায় আর আমি কিছু করব না।

লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনার এই ব্যবহারের কারণ কী? হজরত আলী বললেন—ঘৃণা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে আমি তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র, ধারণ করিনি। তুমি দুষ্ট, মানবসমাজের সমূহ অকল্যাণ করছিলে, তাই তোমাকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। যখন আমার মুখে তুমি থুতু দিয়েছিলে, তখন আমার মনে ক্রোধ হয়েছিল। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর মানুষকে আমি হত্যা করিনে। হজরত আলীর এই চরিত্র মহিমা মানুষের মনকে কত পবিত্র করে দেয়, আত্মবুদ্ধিকে কত ওপরে টেনে তুলে।

গুজরাটের রাজা আহমদ শাহের জামাতা এক সময় একটা মানুষ খুন করেছিল। হত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনেরা যখন বিচারকের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করলে, তখন বিচারক ভাবলেন—জামাতার অপরাধের শাস্তি দিলে সম্রাট আমার ওপর রুষ্ট হতে পারেন। এই চিন্তা তাঁর বিবেকবুদ্ধিকে দুর্বল করে দিল। তিনি নিজের আসনের অবমাননা করে বাদশাহের জামাতাকে বিশেষ কিছু শাস্তি দিলেন না। আহমদ শাহ্ যখন শুনলেন—তাঁর দরিদ্র প্রজা ন্যায্য বিচার পায়নি, তখন তার ভিতরকার মানুষ দারুণ ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। তিনি বিচারককে ডেকে বললেন— সাহেব, বিবেক-বুদ্ধিকে অবহেলা করে ন্যায়বিচারকে অবমাননা করে, আপনি কী করে আমার নরহন্তা জামাতাকে মুক্তি দিলেন?

বিচারক লজ্জিত হয়ে বললেন—সম্রাট, আপনার জামাতা বলেই তাকে কিছু বলিনি, অন্য কেউ হলে তাকে কঠিন শাস্তি দিতাম।

সম্রাট বললেন—এর নাম কি বিচার? আমি যদি অন্যায় করতাম, তাহলে আপনি আমাকেও কি আপনি আইন অমান্য করে মুক্তি দিতে পারতেন? আপনার সুবুদ্ধিকে ভয় করুন, আমাকে ভয় করবেন না। পাছে আমি কী মনে করি, এই ভয়েই হয়তো অপরাধীকে শাস্তি দিতে আপনি কুণ্ঠিত হয়েছেন। আমি কাপুরুষ বা অত্যাচারী রাজা নই। যার স্নেহের ধনকে আমার জামাতা হত্যা করেছে—তার অশ্রুর কি কোনো মূল্য নেই?

আহমদ শাহ্ অবিলম্বে জামাতার পুনর্বিচার করে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

মহৎ ব্যক্তির কাছে সকলেই সমান, আপন-পর নাই। অন্যায় যে করেছে, সে আপন রক্তের কেউ হলেও তিনি তাকে শাস্তির হাত হতে রক্ষা করতে পারেন না।

তুমি অত্যাচারী বড় মানুষ আছ, তুমি গোপনে কোনো দরিদ্রের সর্বনাশ করেছ, তুমি আমার মিত্র, তোমার পত্নীর সঙ্গে আমার পত্নীর আলাপ আছে, তাই বলে কি তোমার স্বপক্ষে আমি কোনো কথা বলতে পারি? আমি আঁখিজলে তোমার ধ্বংসের ব্যবস্থা করব। তুমি মিত্র বলে আমার বেশি আত্মীয় নও, মানবমাত্রেই আমার আত্মীয়। যে অত্যাচারী, যে মিথ্যার উপাসক, যে হীন, দুর্বৃত্ত, সে আমার আত্মীয় হলেও আমার কেউ নয়।

যে মহৎ, যে বড়, তাকে প্রশংসার লোভ না করেই বড় ও মহৎ হতে হবে। জাতির মধ্যে যখন বড় চরিত্র ও উন্নত জীবনের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তখন জাতির দুরবস্থার কথা ভেবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হয়। কতকগুলো কাপুরুষ, মূর্খ ও হীন মনুষ্যের জীবন জাতির দেহে শক্তি সঞ্চার করতে সক্ষম নয়। জাতির শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে কখন, যখন তার সন্তানগুলো মহত্ত্বকে সম্মান করতে শিখবে, —যখন তারা ন্যায় ও সত্যকে সমাদর করতে জানবে।

জীবনে সবসময় ছোট-বড় সকল কাজে মহত্ত্ব ও সুন্দর চরিত্রের পরিচয় দিতে হবে।

শত্রু রোমের দুয়ারে হামলা করেছে। তখনই তারা পঙ্গপালের মতো এসে রোম নগর ধ্বংস করবে। আর তো সময় নাই। নদীর ব্রিজ ভেঙে দিতে পারলে রক্ষা পাওয়া যায়, —নইলে আর কোনো উপায় নাই। যুবক হোরেশিও বললেন—দেশের সম্মান রক্ষা করবার জন্য কে কে প্রাণ দেবার জন্য আমার সঙ্গে যাবে—মৃত্যু অবধারিত; কারণ পেছন থেকে ব্রিজ ভেঙে দিলে আমরা আর কিছুতেই ফিরতে পারব না। মরতে আমাদেরকে হবেই। দুইজন বীর যুবক হোরেশিওর সঙ্গে গেল,—ব্রিজ ভাঙার জন্য আরও বহু মানুষ তাদের সঙ্গে গেল। পেছনের লোকদেরকে হোরেশিও চিৎকার করে বললেন, আমরা সম্মুখে দাঁড়িয়ে শত্রুদের গতিরোধ করছি, তোমরা পেছন থেকে ব্রিজ ভেঙে দাও। শত শত লোক মুহুর্মুহু ব্রিজের ওপর আঘাত করতে লাগল। সম্মুখের অগণিত সৈন্যের সামনে তিন বীর যুবক কুড়ুল তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। শত্রুর বজ্র-ভীষণ আক্রমণের অপেক্ষা

করতে লাগলেন। পেছনের লোকগুলো প্রাণপণ শক্তিতে ব্রিজকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

শত্রুদল ব্রিজের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে দেখল, ব্রিজ ভেঙে দেবার চেষ্টা হচ্ছে—রোম নগরে প্রবেশ করবার এই একমাত্র পথ। ব্রিজ ভেঙে গেলে তাদের অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবে। কোনোরকমে নগরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। সেনানায়ক হুকুম দিলেন—আর বিলম্ব নয়। হোরেশিও আর তার দুই সহযোগীর কুঠারকে ভয় করো না। ব্রিজ ভেঙে গেলে আর আমাদের অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না।

হোরেশিওর দুঃসাহস দেখে মুহূর্তের জন্য শত্রুরা একটু হেসে নিলে, এত বড় সৈন্যবাহিনীর সামনে মাত্র তিনটি বীর। কী উন্মত্ততা!

শত্রুরা হোরেশিওকে শত শত অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে। দুই হাত দিয়ে দীর্ঘ কুড়ুলের বাঁট ধরে হোরেশিও শত্রুদলকে আঘাত করতে লাগলেন। সে কী ভীষণ দৃশ্য! কী অমানুষিক শক্তি-পরীক্ষা! সিংহের সামনে মেষপালের যেমন অবস্থা হয়, বিক্রম-উন্নত বীরবর হোরেশিওর সামনেও শত্রুদের তেমনি অবস্থা হতে লাগল। আর কিছুক্ষণ লড়তে পারলেই কাজ হাসিল হয়, আর পনেরো মিনিটেই ধ্বংস-কার্য শেষ হবে। হোরেশিও প্রাণপণ শক্তিতে লড়তে লাগলেন, যায় প্রাণ যাবে, দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর স্বাধীনতা–সম্মান তাঁর হাতে। এত বড় মহত্ত্বের পরিচয় দেবার সুযোগ জীবনে আর আসবে না।

পার্শ্বেই দুই ব্যক্তি অবসন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর পাঁচ মিনিট হলেই কাজ হাসিল হয়।–

এইবার ব্রিজ বজ্রের শব্দে নদীর মধ্যে ভেঙে পড়ল। হোরেশিও কুড়ুল দূরে নিক্ষেপ করে খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর মাঝে ঝাঁপ দিলেন। দেশকে রক্ষা করা হয়েছে, এইবার মরণেও আনন্দ।

তীরে দাঁড়িয়ে অসংখ্য নরনারী আনন্দ-চিৎকারে গগন কাঁপিয়ে তুলছিল! রোমবাসীরা তীর হতে নৌকা নিয়ে অগ্রসর হলো। শত্রুরা অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। রোম রক্ষা হলো।

মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া মানুষের পক্ষে যদি অসম্ভবও হয়, তবু সে নিচতার পরিচয় কেন দেয়? —জীবনকে পাপ ও অন্যায়ে কলঙ্কিত কেন করে? দিনে-দুপুরে মানুষের মাথায় বাড়ি দেওয়া, পত্নীর ওপর অত্যাচার করা, ব্যভিচার-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া পত্নীর দাবিকে অগ্রাহ্য করে

চরিত্রহীন হওয়া—এইগুলোকেই শুধু পাপের পূর্ণ চিত্র বলা যায় না। মানুষের শত রকমে পতন হয়, শত রকমে সে তার মনুষ্যত্বের অপমান করে। নিজেকে অপমান করার মতো লজ্জা মানবজীবনে আর কী আছে? আত্মসর্বস্ব হয়ে জীবন কাটানো, জ্ঞানান্ধ মানুষের দুঃখ, পাপকে সহ্য করা, নিজের ও জাতির মূর্খতায় কিছুমাত্র কষ্ট বোধ না করা— নিকৃষ্ট মানুষের স্বভাব।

এক সময়ে এক বালক কোনো শহরের পথে বসে কাঁদছিল। সে বাড়ি হতে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছিল, হাতে তার একটা পয়সাও ছিল না, —তখন শীতকাল, শীতের কাপড়ও সঙ্গে ছিল না। এর ওপর বালকের গায়ে জ্বর এসেছিল। সে সেই অপরিচিত দেশের কাকেও চিনত না, কারো কাছ থেকে কেমন করে সাহায্য চাইতে হয় তাও সে জানত না। পথিকেরা কয়েকবার তার কাঁদবার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল—কিন্তু বালক উত্তরে কিছুই বলতে পারেনি।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল! শীতে আর শারীরিক কষ্টে, বালকটি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলো,—মায়ের মুখখানি মনে করে তার চোখ দুটি জ্বলে ভরে উঠছিল। কাছে-কিনারে লোকজনের বিশেষ বসতি ছিল না। খোদা সব জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন, এ তোমরা বিশ্বাস করো। মানুষের জীবনের দুঃখ দেখলে তিনিও দুঃখ বোধ করেন। মানুষ যখন কোনো অন্যায় করে নিজের দুঃখ নিজে রচনা করে, তখন তিনি ব্যথা পেয়েও কিছু করেন না। মানুষ ইচ্ছা করে পাপ বরণ করে নেয়, খোদা তার গতিকে রোধ করেন না। এরূপ করলে তাঁর সৃষ্টির আইনশৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। খোদা কতবার আঁখিজলে মানুষকে 'আয়' 'আয়' বলে ডাকছেন, অবোধ মানুষ তা দেখে না। খোদা জলে, স্থলে, সারা পৃথিবীর পথে পথে মানুষের জন্য কেঁদে বেড়াচ্ছেন। মানুষ তা জানে না।

একটি রমণী কী একটা কাজে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বালকের রোদন শুনতে পেলেন। নারীর প্রাণ—স্নেহ-মমতায় ভরা। রমণী বালকের নিকটে এসে স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, তোমার কী হয়েছে? বালক মায়ের মতোই এক নারীমূর্তিকে দেখে কথা বলতে সাহস পেল। সে বলল— মা, তোমার মতোই বাড়িতে আমার এক মা আছেন। তাঁর কথার অবাধ্য হয়ে আমি পালিয়ে এসেছিলাম, এখন বিপদের একশেষ হয়েছে। শীতের দিনে গায়ে কাপড়চোপড় নেই, গায়ে জ্বর এসেছে,

অজানা-অচেনা দেশ, কোথায় যাই। মায়ের অবাধ্য হয়ে এখন আমাকে পথে পড়ে মরতে হলো।

নারী বললেন, তোমার কেউ না থাকুক, আমি আছি। আমি তোমার মা। চলো আমার সঙ্গে, বেশি দূর নয়। কাছেই আমার বাড়ি।

বালক–না, আমার তো ওঠবার সাধ্য নাই, হাত-পাগুলো হিম হয়ে ভেঙে আসছে।

আচ্ছা, তাহলে আমার কোলে এসো এই বলে রমণী বালককে কোলে তুলে নিলেন। বালককে বুকে নিয়ে নানা সান্ত্বনার কথা বলতে বলতে রমণী বাড়িতে এলেন। ঘরের মেঝে বিছানা পেতে সেখানে বালককে শোয়ালেন। সে রাত্রি আর তাঁর খাওয়া হলো না — সারারাত্রি বালকের বিছানার পাশে বসে রইলেন। তাঁর চোখ দিয়ে বারবার করে পানি পড়ছিল। আহা! কার এ ব্যথার ধন! এই অজানা দেশে পথে পড়ে মরছিল। ভাগ্যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নইলে এর কী অবস্থা হতো?

পরদিন রমণী নিজের খরচে ডাক্তার ডাকলেন। অনেক সেবা-শুশ্রূষায় অবশেষে বালক বেঁচে উঠল। রমণীটিও আনন্দে ভাবলেন—আমার কষ্ট-স্বীকার সার্থক হলো। এখন মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যাক।

আরও কয়েকদিন পরে রমণীটি বালককে কিছু রাস্তা-খরচ আর একখানা নতুন কাপড় দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুত হলেন। প্রাণের কৃতজ্ঞতায় চোখের জলে রমণীর আঁচল ভিজিয়ে বালক বাড়ির পথে রওয়ানা হলো।

ব্যথিত বিপন্ন মানুষকে যে একটা স্নেহের কথা বলেছে, সেই মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছে। মানুষ যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, যখন রোগ-যন্ত্রণার তার শরীর ভেঙে আসে, যখন সে মরণপথের যাত্রী তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করাতে যথার্থ মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। বিপন্ন ব্যক্তি পরিচিতই হোক, আর অপরিচিতই হোক, তাকে আপন বলে বুকে টেনে নিতে হবে। মানুষ মাত্রেই মানুষের আত্মীয়– এ যে মনে করতে পারে তার ধর্মবিশ্বাসের মূল্য খুব বেশি। সারা পৃথিবীর বিপন্ন মানুষকে তুমি কাছে টেনে আন, এত বড় দাবির কথা বলবার সাহস আমার নেই—কিন্তু তোমার চোখের সামনে যে মরে যাচ্ছে তার দিকে তুমি ফিরে তাকাবে না? তোমার কানের কাছে যে আর্তনাদ করছে তার পানে কি তুমি একটুও অগ্রসর হবে না?

সিরাজগঞ্জে এক কাঠওয়ালার কলেরা হয়। বাজারের এক পতিতা নারীকে তার সেবা করতে দেখেছিলাম। সেই পতিতার মধ্যে দেখেছিলাম আমি নারীর মাতৃমূর্তি—সে কী পবিত্র দৃশ্য! শ্রদ্ধাভক্তিতে আমার মাথানত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু খুলে কিছুই প্রকাশ করতে পারিনি! নারীর মাতৃমূর্তি কত সুন্দর! কত পবিত্র! মাতৃরূপিণী নারীজাতির যখনই আমরা অপমান দেখি, তখন মন দুঃখিত হয়ে ওঠে। সে হিন্দু কি মুসলমান, সেকথা ভাববার অবসর থাকে না।

এক ব্যক্তির কথা জানি, তিনি এক সময়ে একজনের কাছ থেকে এক আনার পরসা ধার নিয়ে কী একটা জিনিস কিনেছিলেন, কাছে তখন পয়সা ছিল না। বাড়ি এসে টাকা ভাঙিয়ে সেই লোকটিকে পনেরো আনা দিয়ে নিজে মাত্র এক আনা রাখলেন; লোকটি বিস্মিত হয়ে বলল— আপনি আমার কাছ থেকে মাত্র এক আনা নিয়েছেন, এখন পনেরো আনা দিচ্ছেন কেন? আপনার ভুল হয়েছে। ভদ্রলোক বললেন—বাকি পনেরো আনা তোমাকে দিলাম, ওটা তোমার নিতেই হবে। লোকটি অগত্যা সে পয়সা নিতে বাধ্য হলো।

এখানে এই ভদ্রলোকের চরিত্র-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। জ্ঞান ব্যতীত মানুষের কোনো জায়গাতেই কল্যাণ নাই, কেমন করে যে উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিতে হয় তা সে বুঝতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানের আসন সর্বোপরি। ভদ্রলোকের প্রাণের প্রশংসা না করে পারি না। তার নির্মল সুন্দর আত্মাটি আমাদের ভক্তি পাবার যোগ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়। তাঁর এই দান সত্যই কি মানব জাতির অনুকরণের জিনিস? আমার মন ভয়ে, সংকোচে উত্তর দেয়—না।

মানুষকে দান করো, কিন্তু দান করার জন্যই কি দান করতে হবে? দেখতে হবে, প্রদত্ত পয়সায় দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রকৃত উপকার হবে কিনা। যার আছে, তাকে আরও দিলে পয়সার অপব্যবহার করা হয় না কি? সে সেই পয়সা পেয়ে আনন্দলাভ করতে পারে, কিন্তু সে আনন্দটুকু তার না হলেও বিশেষ ক্ষতি আছে বলে মনে হয় না। এইসব টাকা দিলে জাতির কত কল্যাণ হয়, অজ্ঞান মূর্খ লোকেরা তা বোঝে না। অগণিত টাকা ব্যয় করে তারা মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। মানুষকে সবার আগে জ্ঞানার্জন করতে হবে, জ্ঞানের দ্বারা মানুষ তার জীবনের সকল কর্ম ঠিক করে নিতে

পারে—তাকে বলে দিতে হয় না, এই পথে তুমি চলো। জ্ঞান যার নেই, সে কিছুই বোঝে না,—মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

রামতনু লাহিড়ী মহাশয় একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি খুব ব্যস্ততার সঙ্গে পথ অতিক্রম করতে লাগলেন, —যেন কে তাকে মারতে তাড়া করেছে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবার স্থির হলেন। সঙ্গের বন্ধুটি ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—ভাই, এক ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। আমি জানি, তাঁর অবস্থা বড় শোচনীয়, টাকা দেবার কোনো সংগতি নাই। আমার দিকে তিনি আসছিলেন, আমি কোনো গতিকে পাশ কাটিয়ে সরে এসেছি। আমাকে দেখলে তাঁর ভারি লজ্জা হতো। ভদ্রলোককে কী করে লজ্জা দেব, এই ভেবেই আমি পালিয়ে এলাম। এমন করে পরের লজ্জার ব্যথাকে অনুভব করবার ক্ষমতা কয়জনের থাকে? সাধারণত মানুষ সবসময়ই মানুষকে লজ্জা, ব্যথা দিতে আনন্দ বোধ করে।

জাতি বলো, বংশমর্যাদা বলো, মহত্ত্বের তুলনায় কিছুই কিছু নয়। মানুষ যেখানেই চরিত্র-মাহাত্ম্য দেখে সেখানেই ভক্তিতে তার মাথা নত হয়। বড়লোক বলেই কি মানুষ বেশি শ্রদ্ধা পাবার উপযোগী? বড়লোককে মানুষ লাভের আশায় শ্রদ্ধা দেখাতে পারে, কিন্তু কুস্বভাব লোক কখনো মানুষের অন্তরের রাজা হতে পারে না। মানুষ ছোট হোক, বড় হোক, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, যখনই তার মধ্যে মহত্ত্ব দেখব, তখনই তাকে আমরা শ্রদ্ধা করব। ছোটলোক বলে সমাজে যে সর্বনিম্নস্তরে পড়ে আছে, সে কি মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারে না?

আমি দেখেছি ব্যথিত মানুষের গৌরব-দীপ্ত মুখ, সে মুখ কত সুন্দর! কত পবিত্র! রূপ যদি মানুষের থাকে, তবে তা মহত্ত্বের আলোক-ভরা মুখেই আছে। রূপবান-রূপময়ী নরনারীর নীচাশয়তা তাদের রূপকে কতখানি কুৎসিত করে, তাও আমি দেখেছি।

যা বিশ্বাস করি, মানুষের ভয়ে অথবা লাভের আশায় তা বলতে ভয় করা কত বড় দুঃখের বিষয়! এই অবিচারটুকু জয় করবার জন্যই মানুষ স্বাধীনতা চায়। বিশ্বাসকে যে যতখানি চেপে রাখে সে ততখানি দরিদ্র।

যার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, তিনি কিছুতেই জীবনের সত্যকে এমনভাবে ব্যর্থ করে দিতে চান না। এতে তাঁর মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

অনেক টাকা মাইনে পাই, সেই লোভে কী করে আমি আমার কোটি টাকার আত্মাটিকে বিক্রয় করতে পারি। আমার দুর্জয় মনুষ্যত্ব, আমার জীবনের উচ্চ সার্থকতা জানি কোনো জিনিসের বিনিময়েই নিরর্থক করে দিতে পারি না। অর্থ অর্জন করে শরীরকে বাঁচানো হবে, অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকদের কাছে খুব প্রশংসা লাভ করা যাবে, বন্ধুবান্ধবেরা আমার সুনাম গান করবে, কিন্তু তাতে যদি আমার আত্মার ভাষা নীরব হয়ে যায়, আমার মনুষ্যত্ব নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, তাহলে আমি আমার শরীরকে বাঁচাতে চাই না, আমি কারো প্রশংসা, কারো সুনাম পাবার লোভ করি না।

তখনও হজরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সংস্কারের বাণী নিয়ে জগতে আসেননি। রোম নগরের এক বাড়িতে বসে একদিন এক মহিলা সেলাইয়ের কাজ করছিলেন। বাড়িতে তিনি একাকিনী ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি দরজার দিকে চাচ্ছিলেন কেউ দরজা ঠেলে ভিতরে আসে কিনা।

তখন ছিল হজরত ইসার (আ.) যুগ। রোমের যারা মূর্তিপূজা ছেড়ে হজরত ইসার (আ.) সত্যধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের ওপর ভারী অত্যাচার হতো। কোনোরকমে যদি শাসক সম্প্রদায়ের কেউ জানতে পারত কোনো ব্যক্তি ইসার (আ.) ধর্ম গ্রহণ করছে, তখনই তাকে বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া হতো। নানা নির্যাতনে তাকে মেরে ফেলা হতো। ফলে নবধর্মাবলম্বীদেরকে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস গোপন করে রাখতে হতো। যারা তা পারত না, তাদের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। এইভাবে বহু ধর্মপ্রাণ রোমবাসীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। যে নারীর কথা বলছিলাম,—এর স্বামী কিছুদিন আগে ধর্মবিশ্বাসের জন্য শহিদ হয়েছিলেন।

প্রাণভয়ে মানুষ নিজের বিশ্বাস ও সত্যকে অনেক সময় গোপন করে চলে, কিন্তু সামান্য লাভে বা কল্পিত সুখের জীবনের জন্য যে নিজকে অবনমিত করে নিজের মনুষ্যত্ব ও বিবেক-বুদ্ধিকে বিসর্জন দেয়, সে কীরূপ মানুষ!

মহিলাটির একটি ছেলে ছিল, তাকে রেখে তার পিতা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ছেলেটি বাড়িতে মাকে একাকিনী রেখে প্রত্যহ স্কুলে যেত। স্বামীর একমাত্র ছেলে, প্রৌঢ়ার নিঃসহায় নারী-জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা,

আজ বিদ্যালয় হতে ফিরে আসতে বিলম্ব করছে, তাই তিনি আকুল ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নারীজাতির সন্তানের প্রতি কত মায়া তা আমরা ধারণা করতে পারি না। মায়ের মূর্তিতে নারী কত বড়? নারী দরিদ্রা হোক, পতিতা হোক, সন্তানকে বুকে করে সে বাণীর আসন অধিকার করে। নারী যখন শিশুর মুখে সুধা-ধারা ঢালে, তখন তাকে মা বলে সালাম করলে দোষের হয় না। নারীকে যেখানে আঁখিজল ফেলতে হয়, সেখানে খোদার অভিশাপের আগুন জ্বলে।

প্রৌঢ়ার হাতের কাজ ভুল হয়ে যাচ্ছিল। ছেলে বাড়ি আসতে দেরি করছে। বাতাস দরজায় ধাক্কা দিয়ে গেল, প্রৌঢ়া চমকিত হয়ে চেয়ে দেখলেন, কেউ না।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে এমন সময় বালক প্যানক্রিয়াস বাহির হতে 'মা' বলে ডাকল। হাতের কাজ ছুড়ে ফেলে প্রৌঢ়া দরজা খুলে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন–"বাপ, আজ যে তোর এত দেরি হলো?" বালক বলল–"কেন মা, এত ব্যস্ত হয়েছ? আমার বয়স তো আঠারো।" মা ছেলেকে আঁকড়ে ধরে একখানা চেয়ারের ওপর বসলেন। ছেলে মাটিতে মায়ের পায়ের কাছে বসে কোলে বাহু রেখে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মা ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—"আজ কেন এত দেরি হলো? তুই তো রোজই বেলা থাকতে আসিস। জানিস তো, নিজের দেশে আমরা কতটা প্রবাসী হয়ে বাস করছি। তোর বাপকে রোমবাসীরা হত্যা করেছে—আমার সবসময় মনে ভয় হয়।"

ছেলে—মা, কীসের ভয়? বিশ্বাসের জন্য বাপ মৃত্যু বরণ করেছিলেন, এর চেয়ে মোহনীর মৃত্যু কি আর আছে? আমার যদি অমনি করে মরণ হয়, তাতে আমার জীবন ধন্য হবে।

মা—বাপ, তুই এমন কথা কী করে বললি? তুই যে এখনো আমার দুধের ছেলে। আজ আমার জীবন সার্থক হলো। কে তোকে এমন মধুর কথা শিখিয়েছে?

ছেলে—মা, তুমিই তো আমাকে শিখিয়েছ, সত্য ও ন্যায়ের জন্য আমাদেরকে যেকোনো ক্ষতি স্বীকার করতে হবে! গৌরবময় মরণের মধ্য দিয়ে যে মুক্তি আমরা পাই, তা কত সুন্দর! মহান মৃত্যু দিয়ে দুঃখময় পঙ্কিল জগতের মাঝ থেকে যদি জীবনের অভিশাপকে সরিয়ে নেওয়া যায় তবে তা মানুষের পক্ষে কত বড় লাভ!